পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI

মঙ্গলবার, ১৮ জুলাই ২০১৭

উত্তরণ

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

সার্বিক বিকাশে প্রয়োজন খেলাধুলো

রুমুন চক্রবর্তী

আজকাল প্রায়ই মায়েদের বলতে শোনা যায় যে তাঁদের বাচ্চারা কথা কম বলে, অকারণ জেদ করে আরও কত কী! কেউ কেউ এতটাই কম মিশুকে স্বভাবের হয়ে উঠছে যে খুব চেনা-পরিচিত মুখ না হলে, তাঁদের সঙ্গে সহজে কথা অবধি বলতে চায় না। কেমন একটা ঘরকুনো স্বভাব। জড়পদার্থের মতো একজায়গায় বসে হয় টিভি নয় কম্পিউটার না হলে মোবাইলে ব্যস্ত থাকতে বেশি পছন্দ করে।

এই সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। সমাধানের চেষ্টায় বাবা-মায়েরা হিমশিম খাচ্ছেন। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে এই সমস্ত কিছুর প্রধান কারণ হল আজকালকার বাচ্চাদের আউটডোর গেমসের অভ্যাস চলে যাওয়া। স্কুল, প্রাইভেট টিউশন, আঁকার ক্লাস, সাঁতার, ক্যারাটে, গান, নাচ, আবৃত্তি, নাটক— হাজারো বিষয়ে ব্যস্ত থাকে আজকের প্রজন্ম। শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার ফুরসত নেই তাদের। তাই যেটুকু ফাঁকফোঁকর পায়, তাতে টিভি আর মোবাইল গেম ছাড়া আর কিছুর কথা ভেবে ওঠার সুযোগই পায় না।

আপাত দৃষ্টিতে আমরা হয়তো ভাবছি, সে যেভাবেই হোক রিলাক্সেশন তো হচ্ছে। ভালো তো থাকছে ওরা। আনন্দে থাকছে। কিন্তু বাস্তবটা একেবারেই উলটো। সঠিক ভাবে বড় হতে গেলে দরকার দু-ধরনের বিকাশ। এক শারীরিক, দুই হল মানসিক।

বাচ্চাদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঠিক বৃদ্ধি হল শারীরিক বিকাশ। আর মানসিক বিকাশ হল আচার-ব্যবহার, চিন্তা-চেতনা, কথা বলা, অনুভূতি ও ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষমতা অর্জন করা। তাই শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ছাড়া কোনও বাচ্চা তথা মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। এই দুই বিকাশই ঘরের বাইরে বেরিয়ে আর পাঁচটা সমবয়সি বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাধুলা ও মেলামেশার মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

একসঙ্গে খেলতে গেলে বাচ্চা যেমন সহনশীলতা শেখে, তেমনই তাদের মধ্যে তৈরি হয় একে-অপরের পছন্দ-অপছন্দকে মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতা। একসঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটানোর ফলে তারা ভাগ করে নেওয়ার পাঠ শেখে। শেখে হেরে গিয়েও তা হাসিমুখে মেনে নিয়ে পরের দিন জিতে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে। একে-অপরের আনন্দে বা দুঃখে ভাগীদার হতে শেখে। একসঙ্গে থাকা তাদেরকে একে অপরের প্রতি টান অনুভব করায়। এইভাবে ধীরে ধীরে শিখে যায় বন্ধুত্বের মানে। চিনতে শেখে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন মানসিক অবস্থানের মানুষকে যা পরবর্তী সময়ে তাকে সঠিক মানুষ নির্বাচনে ভীষণভাবে সহায়তা করে। এটার আরও একটা ভালো দিকও আছে। খেলাধুলার

এরপর তিনের পাতায়

দুইয়ের পাতায়
জেনারেল নলেজ
মোবাইল টাওয়ারের বিকিরণ ও এর প্রভাব
তিনের পাতায়
স্পেশাল টিউশন
ইংলিশ গ্রামার ও বাংলা ব্যাকরণ
চারের পাতায়
ক্লাস সেভেন ও এইট-এর টিউশন
ইতিহাস
পাঁচের পাতায়
ক্লাস নাইন-এর টিউশন
ভৌতবিজ্ঞান
ক্লাস টেন-এর টিউশন
জীবন বিজ্ঞান
ছয়ের পাতায়
জেনারেল নলেজ
হিম জগতের প্রাণী
সাতের পাতায়
ক্যুইজ
এডু অ্যাডভাইস
আটের পাতায়
জেনারেল নলেজ
রেইন ফরেস্ট

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

খেলাধুলোও করতে হবে

স্মিতা দাঁ শিক্ষিকা,
বেহালা কিশোরভারতী গালর্স হাই স্কুল

আগে খেলাধূলা তারপর পড়াশোনা। চাপমুক্ত থাকার জন্য খেলাধূলা খুবই জরুরি। শিক্ষাব্যবস্থা যতই আধুনিক হোক না কেন একটু চাপমুক্ত না থাকলে পড়াশোনার চাপ নেওয়া সম্ভব নয়। সেটি একজন পড়ুয়ার বাড়ির লোককেও বুঝতে হবে। তাই আমি মনে করি, বাড়ি গিয়ে আগে খেলাধুলো করো তারপর পড়তে বসো। সেইসঙ্গে পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমি বলব একজন অভিভাবককে আরও সচেতন ও দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। তবেই একটি বাচ্চাও দায়িত্ব নিতে শিখবে। অনেক সময় আমরা দেখি পরীক্ষা চলাকালীন পড়ুয়ারা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বেড়াতে চলে গেছে। পরে আমাদের এসে পরীক্ষা না দিতে আসার জন্য এই কারণ বলা হয়। ওই জায়গায় একজন শিক্ষিকা খুব বেশি হলে বলতে পারেন পরের বার থেকে যেন এরকম না করে। পরীক্ষাটাকে সিরিয়াসলি নেওয়ার কথা বলতে পারেন। কিন্তু এই বিষয়ে একজন অভিভাবককে সচেতন হতে হবে। কারণ, তাদের বুঝতে হবে পরীক্ষা একজন পড়ুয়ার জন্য কতখানি গুরুত্ব বহন করে।

এ তো গেল নীচু ক্লাসের কথা। পাশাপাশি উঁচু ক্লাস বলতে অষ্টম শ্রেণি থেকে শুরু। অষ্টম শ্রেণি হল একটি এমন একটি ধাপ যেখান থেকে দশম শ্রেণি ও জীবনের লড়াইটা শুরু হয়। এই সময় একজন অভিভাবক ও শিক্ষিকাদের একটু কড়া মনোভাব নিতেই হবে। *এরপর চারের পাতায়*

উত্তরণ-এর মুখোমুখি: রোল নং ওয়ান

লিখে অভ্যাস করলে পড়া মনে থাকে

মল্লিকা ভট্টাচার্য সপ্তম শ্রেণি,
বেহালা কিশোর ভারতী গালর্স হাই স্কুল

নার্সারি থেকেই বেহালা কিশোর ভারতী গালর্স হাই স্কুলে পড়া শুরু মল্লিকার। পঞ্চম শ্রেণি থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত প্রথম স্থানের রেকর্ড তার ঝুলিতে। বড় হয়ে মল্লিকা নিজেকে শিক্ষিকা হিসেবে দেখতে চায়। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের পড়ানোর প্রতি নিষ্ঠা ও ভালোবাসা থেকেই এই পেশার প্রতি অনুরক্ত মল্লিকা।

এখনও পর্যন্ত প্রথম স্থান ধরে রাখতে কীভাবে পড়াশোনা করে এবং তার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য কীভাবে নিজেকে তৈরি করছে, সেই বিষয় কথা হল উত্তরণের সঙ্গে।

উত্তরণ: কোনও রুটিন মেনে পড়াশোনা করো?

মল্লিকা: না, সেইরকম কোনও বাধাধরা রুটিন নেই। কারণ সকালে টিউশন নিতে যাই। তারপর স্কুল। ছুটির পর বাড়ি ফিরে টিউশনে যেতে হয়। বাড়ি ফিরে এসে স্কুল আর টিউশনের পড়াগুলিকে ফের ঝালিয়ে নিই। তাতে পড়া ভালো মনে থাকে।

উত্তরণ: স্কুলের বাইরে তোমার কী মনে হয় আলাদা করে টিউশন নেওয়ার প্রয়োজন আছে?

মল্লিকা: আমি স্কুলের সব শিক্ষিকাদের কাছ থেকে পড়াশোনার বিষয়ে সবরকম সহযোগিতা পাই। তবে আমার মনে হয় টিউশন নিলে পড়া বুঝতে আরও সুবিধে হয়।

উত্তরণ: কোন কোন বিষয় টিউশন নাও?

মল্লিকা: সব বিষয়ে।

উত্তরণ: তোমার প্রিয় বিষয় কী?

মল্লিকা: বাংলা।

উত্তরণ: পড়া মনে রাখার জন্য তুমি কী করো?

মল্লিকা: পড়া মুখস্থ করে সেটি লিখে অভ্যাস করি। আমার বন্ধুদেরও আমি বলব লেখার ওপর জোর দিতে। এতে পড়া ভালো মনে থাকে। ভুল হওয়ার সম্ভবনা কম থাকে।

উত্তরণ: বড় হয়ে কোন পেশাকে জীবনে বেছে নিতে চাও?

মল্লিকা: শিক্ষিকা।

উত্তরণ: পড়াশোনার ক্ষেত্রে তোমার অনুপ্রেরণা কে?

মল্লিকা: আমার বাবা, মা। এছাড়াও আমার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুসরণ করে আমি পড়াশোনা করি। আমি বড় হয়ে ওঁদের মতো হতে চাই।

উত্তরণ: তোমার ভবিষ্যৎ আরও সুন্দর হোক এই কামনা থাকল।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৮ জুলাই ২০১৭

মোবাইল টাওয়ারের বিকিরণ ও এর প্রভাব

মোবাইল টাওয়ার এবং তার বিকিরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে নিয়ে চারপাশে এখন বেশ উৎকণ্ঠার পরিবেশ লক্ষ করা যায়। কেননা, বর্তমান সিমলেস-কানেকটিভিটির দুনিয়ায় বিভিন্ন টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলির মধ্যে মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি। আমাদের দেশে এই মুহূর্তে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা একশো কোটি ছাড়িয়েছে এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র দেশে কাজ করে চলা মোবাইল টাওয়ারের সংখ্যাও পাঁচ লক্ষের বেশি বলে জানা গেছে। পরিষেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থাও, ক্রমেই এই বিপুল বাজারকে ধরার জন্য নানা সুযোগ-সুবিধার কথা বলে ক্রেতাদের প্রলুব্ধ করছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে ঠিক কতখানি এই মুঠোফোনটির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি, তা নিশ্চয়ই আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এমন একটি নিত্য-বাবহার্য প্রযুক্তি সত্যি সত্যিই জনস্বাস্থ্যের উপর কোনও স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিস্তার করছে কি না, সে বিষয়ে এখন আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বিকিরণ বিষয়টিকে সহজ দু-চার কথায় জেনে নেওয়া প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বিকিরণ বললেই মানুষ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সম্পর্কে ভেবে বসেন। মোবাইল টাওয়ারজনিত বিকিরণের সঙ্গে তেজস্ক্রিয়তার সম্পর্ক টানাটা একেবারেই অনুচিত হবে। যখন আমরা ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন বা যোগাযোগের কথা বলি, তখন আসলে আমরা আমাদের বার্তাগুলিকে অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের কিছু তরঙ্গের মাধ্যমে অন্যত্র পাঠাবার চেষ্টা করে থাকি। এই সমস্ত তরঙ্গগুলি কোনও মাধ্যম ছাড়াই আমাদের বার্তাকে দূরে নিয়ে যেতে পারে। এই উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ প্রবাহকেই আমরা বিকিরণ বলে চিহ্নিত করে থাকি এবং যে বিষয়টিকে এবারে বলা প্রয়োজন সেটি হল, যে কোনও সজীব কোষেই এই বিকিরণ শোষিত হয়ে থাকে। বস্তু-বিশেষে শুধু তার মাত্রার ব্যতিক্রম ঘটে।

মোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিতে একটি শব্দ বহুলভাবে প্রচারিত। আমরা সেটিকে বলি এসএআর বা স্পেসিফিক অ্যাবসর্পশন রেট। কোনও বস্তু প্রতি এককে মোট কত পরিমাণ বিকিরণ শোষণ করছে তার পরিমাণ নির্দেশক হিসাবে এই পরিমাপটিকে ব্যবহার করা হয়। দুঃখের বিষয় হল, পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশেই মোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি উপরে এসএআর বিষয়ক কড়া নির্দেশিকা জারি থাকলেও, আমাদের দেশে সেইরকম কোনও নির্দেশিকা এখন অবধি নেই। এমনকী, ক্রেতামহলেও এ সম্পর্কে প্রচারে ঘাটতি রয়েছে।

যেহেতু মোবাইল টাওয়ার বিকিরণের কুফল সংক্রান্ত যে সমস্ত গবেষণা এখন পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে হয়ে এসেছে বা হয়ে চলেছে, তার প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটিগুলো সবসময় সাধারণের নাগালে আসে না। সেই কারণে কিছু সাধারণ তথ্যের মাধ্যমে এই বিষয়ের কয়েকটি দিককে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল। ২০১১ সালের ৩১ মে প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার শাখা সংগঠন 'ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যানসার' তাদের রিপোর্টে জানায়, মোবাইল টাওয়ার বিকিরণকে সম্ভাব্য কারসিনোজেন বা ক্যানসার সৃষ্টিকারী রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সম্প্রতি আইআইটি মুম্বই-এর অধ্যাপক গিরীশ কুমার তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, ওরলি, মুম্বইতে উষাকিরণ আবাসনের ষষ্ঠ থেকে দশম তলা অবধি আবাসিকদের ভিতরে গত কিছু বছরে ক্যানসার আক্রান্তদের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তার কারণ স্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন যে, উষাকিরণ আবাসনের ঠিক উলটোদিকের আরেকটি আবাসনের মাথায় বসানো মোবাইল টাওয়ারের মোট বিকিরণের বেশিরভাগটুকুই নির্দিষ্ট ভাবে উষাকিরণ আবাসনের ষষ্ঠ থেকে দশম তলাকেই প্রভাবিত করে চলেছে। বিপদটাকে বোধহয় সত্যিই একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ক্যানসার হয়তো একেবারে একটি প্রাণঘাতী প্রভাব হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু কপালজোরে ক্যানসার থেকে বাঁচলেও, দৈনন্দিন জীবনেই মোবাইল টাওয়ার থেকে নিঃসৃত বিকিরণের একাধিক স্বল্পমেয়াদি অথচ যথেষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা সতর্ক হতে বলেছেন। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, মোবাইল টাওয়ার বিকিরণের প্রভাবে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে, বিস্মৃতি দেখা দিতে পারে, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন থেকে স্নায়বিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে। ১৯৯৫ এবং ২০০৫ সালের দুটি গবেষণাপত্রে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, এক্স-রশ্মির প্রভাবে কেমন করে মানব ডিএনএ-গুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, একই প্রভাব মোবাইল টাওয়ার থেকে নিঃসৃত উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গগুলির ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে মানব শরীরে অত্যন্ত ক্ষতিকারক প্রভাব দেখা দিতে পারে। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত একটি সেমিনারে উপস্থিত থেকে গিরীশকুমার জানান, অস্ট্রিয়ার সালজবার্গ এবং জার্মানির একটি শহরে দুটি পৃথক মোবাইল টাওয়ার বসানোর ফলে পার্শ্বস্থ এলাকায় ক্যানসার রোগের প্রবণতা আট থেকে দশগুণ অবধি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধরনের পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছে ব্রাজিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলির থেকেও।

এ তো গেল মানব শরীরের উপর মোবাইল বিকিরণের প্রভাব। আমাদের চারপাশের আরও যে সমস্ত সজীব বস্তুদের অস্তিত্ব দেখা যায়, তাদের অর্থাৎ, পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ এমনকী উদ্ভিদের উপরেও এই বিকিরণের প্রভাব নিয়ে গবেষণার কাজ চলছে। দীর্ঘমেয়াদের বিভিন্ন গবেষণাতেই এটি উঠে এসেছে যে, মোবাইল টাওয়ারের কাছাকাছি এলাকায় ছোট পাখি ও মৌমাছিদের সংখ্যা দিনে দিনে কমে আসে। তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এমনকী প্রজনন ক্ষমতায়ও এর প্রভাব পড়ে। অধ্যাপক কুমার আরও বলেন, গুরগাঁও-দিল্লি হাইওয়ের উপর একটি খামারবাড়িতে ফলবতী উদ্ভিদের প্রজনন ক্ষমতা গত কয়েক বছরে লক্ষণীয়ভাবেই কমে এসেছে। এবং এর কারণ হিসাবে ওই খামারের কাছাকাছি বেশ কয়েকটি মোবাইল টাওয়ারের উপস্থিতিকেই তিনি সন্দেহ করেন।

দেশের টেলিকম মন্ত্রক অবশ্য এ সমস্ত বিষয়কে গুরুত্ব দিতে নারাজ, উলটে তাঁরা এ সমস্ত কিছুকেই আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা হিসাবে দেখাতে উৎসাহী। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সরকারের পরিবেশ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ এবং উদ্ভিদের উপর মোবাইল বিকিরণের প্রভাব খতিয়ে দেখতে সেই সময় অবধি মোট ৯১৯টি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে ১৯৬টি সমীক্ষার সুনিশ্চিত কোনও বক্তব্য উঠে আসতে পারেনি। এছাড়া, ১৩০টি সমীক্ষায় দাবি করেছে যে বাস্তুতন্ত্রের উপর মোবাইল বিকিরণের কোনও ক্ষতিকারক প্রভাব নেই। অথচ ৫৯৩টি সমীক্ষাতেই সরাসরি বাস্তুতন্ত্রের উপর মোবাইল বিকিরণের ক্ষতিকারক প্রভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

যে প্রযুক্তি আমাদের এতখানি কাছের ও প্রয়োজনের, সেই প্রযুক্তি সম্পর্কে যখন একথানি সন্দেহের অবকার রয়ে যায়, তখন অন্যান্য দেশগুলির মতই বোধহয় বিষয়টিকে যথাযোগ্য গুরুত্বের জায়গাতে রেখেই অনুসন্ধান চালানো উচিত। প্রযুক্তির একদিককার আশীর্বাদ, অন্যদিক দিয়ে যেন অভিশাপ রূপে দেখা না দেয়, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখাটা একান্তভাবেই আজ দরকার।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৮ জুলাই ২০১৭

স্পেশাল টিউশন: ইংলিশ গ্রামার

Direct and Indirect Speech

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উক্তি: কোনও বক্তার উক্তি দু'ভাবে জানানো যেতে পারে—

১) বক্তা যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা অবিকল উদ্ধৃত করে। একে বলা হয় Direct Speech বা প্রত্যক্ষ উক্তি।

২) তাঁর কথা অবিকল তুলে না ধরে তাঁর বক্তব্য পেশ করা। একে বলা হয় Indirect Speech বা পরোক্ষ উক্তি।

Examples:

Direct: Susama says, I am doing my sums now.'

Indirect: Susama says that she is doing her sums now.

লক্ষ করো যে, Direct Speech এ বক্তার ব্যবহৃত কথাগুলি আলাদা করে দেখাবার জন্য উদ্ধৃতিসূচক কমা বা যতি চিহ্ন (-') ব্যবহার করা হয়েছে। Indirect Speech-এর ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

Reporting verb-এর পরে একটি কমা (,) বসিয়ে Direct Speech-এর অংশটুকু Inverted Comma-র মধ্যে রাখতে হয়।

He said, I am not feeling well.'

তাছাড়া Direct থেকে Indirect Speech-এ পরিবর্তন করার জন্য অন্য কতগুলি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

১) Indirect বা পরোক্ষ উক্তি করার আগে That এই conjunction-টি ব্যবহার করা হয়েছে।

২) 'I' এই Pronoun এর জায়গায় She' Pronoun ব্যবহার করা হয়েছে।

৩) am' verb টির জায়গায় is' ব্যবহার করা হয়েছে।

Remember:

Ram said, I am unwell today.'

রাম বলল, আমি আজ অসুস্থ'

In the above sentence said' is the Reporting Verb. When this sentence is changed to Indirect Speech is becomes:

Ram said that he was unwell that day.

লক্ষ করো, যদি Reporting Verb Past Tense-এ থাকে তাহলে বাক্যটিকে Direct থেকে Indirect Speech-এ আনতে হলে Direct Speech-এর Verb কেও Past Tense করতে হবে।

প্রতক্ষ্য উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করার নিয়মগুলি :

১) যদি Reporting বা Principal verb-টি Past Tense-এ থাকে তাহলে Direct Speech-এর যাবতীয় Present Tense-এর Verb কে প্রয়োজনীয় Past Tense-এ নিয়ে যেতে হয়।

২) সাধারণ বর্তমান কালকে সাধারণ অতীতে নিয়ে যাওয়া হয়:

Direct: Som said, I play football'

Indirect: Som said that he played football.

৩) চলমান বর্তমানকে চলমান অতীতে নিয়ে যেতে হয়:

Direct: She said, My mother is cooking'

Indirect: She said that her mother was cooking.

৪) পুরাঘটিত বর্তমানকে পুরাঘটিত অতীতে নিয়ে যেতে হয়

Direct: Tarit said, My brother has broken his leg.'

Indirect: Tarit said that his brother had broken his leg.

যদি Reporting Verb টি Past Tense-এ থাকে ভবিষ্যৎ বোঝাতে Direct Speech এর Shall', Will' যথাক্রমে should' এবং would'-এ পরিবর্তিত হয়।

Example:

Direct: He said, I shall go to Mumbai tomorrow'

Indirect: He said that he would go to Mumbai the next day.

Direct: Jaya said, My father will take me to school'

Indirect: Jaya said that her father would take her to school.

স্পেশাল টিউশন: বাংলা ব্যাকরণ

সমাস

প্রথমেই আমরা জানব সমাস কাকে বলে? সমাস কথার অর্থ সংক্ষেপণ। সমাস বাক্যকে ছোট করে। সমাসের মাধ্যমে বহুপদ পরিণত হয় একপদে। একাধিক পদের মিলনে যে পদ সৃষ্টি হয় তাকে সমাস বলে। এককথায় বলতে গেলে সমাস হল একাধিক পদের একপদীকরণ।

এবার দেখে নেওয়া যাক সমাসের উদাহরণ:

যেমন— সিংহাসন। এখানে পূর্ব পদ (সিংহ), আর পর পদ হল (আসন)। সিংহাসন = সিংহ চিহ্নিত আসন।

জানো, সমাস কত প্রকার ও তার ভাগগুলি কী কী?

সমাস ছয় প্রকার: যথা: ১) দ্বন্দ্ব সমাস, ২) দ্বিগু সমাস, ৩) বহুব্রীহি সমাস, ৪) কর্মধারয়, ৫) তৎপুরুষ সমাস, ৬) অব্যয়ীভাব সমাস

১) দ্বন্দ্ব সমাস: আমরা প্রথমে দ্বন্দ্ব সমাস নিয়ে আলোচনা করব। দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদের অর্থ প্রধান থাকে। পূর্ব পদ ও পর পদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্যে এবং/ও/আর অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

দ্বন্দ্ব সমাসের আবার ২টি ভাগ:

অলুক দ্বন্দ্ব: সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ পায় না। যেমন— হাতে-কলমে, দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে।

বহুপদী দ্বন্দ্ব: তিন বা বহুপদের দ্বন্দ্ব। যেমন— সাহেব-বিবি-গোলাম, আমি-তুমি ও সে (আমরা)।

২) দ্বিগু সমাস: এই সমাসে পর পদের অর্থ প্রধান। পূর্ব পদ সংখ্যা বাচক এবং ব্যাস বাক্যে সমাহার শব্দটি থাকবে।

যেমন— তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল। তিন মাথার সমাহার = তেমাথা। তিন পদের সমাহার = ত্রিপদী।

৩) বহুব্রীহি সমাস: কোনও পদের অর্থ প্রদান না করে তৃতীয় অর্থ প্রদান করে এই সমাস।

বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যে যার/যাতে ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ থাকে।

যেমন— মহান আত্মা যার = মহাত্মা; স্বচ্ছ সলিল যার = স্বচ্ছসলিলা।

ব্যাসবাক্যে সহ'/সহিত' থাকলে, সমস্ত পদে স' হয়।

যেমন— বান্ধবসহ বর্তমান = সবান্ধব; সহ উদর যার = সহোদর।

বহুব্রীহি সমাস ৮ ভাবে হতে পারে। যথা—

ক) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি;

খ) ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি;

গ) ব্যতিহার বহুব্রীহি;

ঘ) নঞ বহুব্রীহি;

ঙ) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি;

চ) প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি;

ছ) অলুক বহুব্রীহি;

জ) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি।

কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবে, সেতার (তিন তারের সমাহার) বহুব্রীহি নয়, কারণ সেতার বিশেষ্য। বহুব্রীহি সমাসে সংখ্যা বোঝালেও তা বিশেষণের অর্থ প্রকাশ করবে।

এছাড়াও জেনে নাও, নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাস:

জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্মৃত; পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ; অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ; নরাকারে পশু যে = নরপশু।

৪. কর্মধারয় সমাস: (কর্ম+ধৃ+নিচ্+আ) ব্যাসবাক্যে সাধারণত— যে-সে, যেই-সেই, যিনি-তিনি, যা-তা, আগে-পরে, ন্যায়, রূপ ইত্যাদি শব্দ থাকে।

যেমন— যে চালাক সেই চতুর = চালাক-চতুর। যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজ সাহেব।

কর্মধারয় সমাসের প্রকারভেদ:

ক) মধ্যপদলোপী: সমস্ত পদে মধ্যপদ লোপ পায়।

যেমন— সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন।

খ) রূপক: পূর্ব পদ এবং পর পদের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করলে রূপক কর্মধারয় হয় এবং ব্যাসবাক্যে রূপক শব্দটি বিদ্যমান থাকবে।

যেমন, ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল।

গ) উপমিত কর্মধারয়: প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমিত/উপমেয়।

যেমন— মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র

ঘ) উপমান কর্মধারয়: উপমান অর্থ- তুলনীয় বস্তু। পরোক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমান।

যেমন— তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষার শুভ্র

৫) তৎপুরুষ সমাস : পূর্ব পদের বিভক্তি লোপে তৎপুরুষ সমাস হয়।

যেমন— বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন।

তপুরুষ সমাস হয় নয় ভাবে: দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী —এই ছয় ধরণের। তৎপুরুষ সমাস হয় এই ছয় ধরনের বিভক্তি থাকলে।

ব্যাসবাক্যে ন' থাকলে- নঞ তৎপুরুষ হয়।

ব্যাসবাক্যের শেষে যে' থাকলে উপপদ তৎপুরুষ হয়।

আর বিভক্তি লোপ না পেলে অলুক তৎপুরুষ হয়।

যেমন— দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখ প্রাপ্ত; বইকে পড়া = বইপড়া; চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী;

৬) অব্যয়ীভাব সমাসে পূর্ব পদের অর্থ প্রধান। অব্যয়ীভাব সমাসের পূর্বপদে অব্যয় যুক্ত থাকে এবং অব্যয়ের অর্থ প্রধান থাকে।

আর ব্যাসবাক্যের শেষে বেশির ভাগ সময় থাকে- সমীপে, অভাব, পর্যন্ত, তুল্য, সদৃশ, অতিক্রান্ত, কূল ইত্যাদি শব্দ।

যেমন— কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ; কুলের সমীপে = উপকুল; দিন দিন = প্রতিদিন; আমিষের অভাব = নিরামিষ; ভাবনার অভাব = নির্ভাবনা; জলের অভাব = নির্জল।

সার্বিক বিকাশে প্রয়োজন

খেলাধুলো

প্রথম পাতার পর

ফলে শরীরের ইমিউনিটি বৃদ্ধি পায়। মেটাবোলিজম ভালো হয়। যার ফলে দীর্ঘ নীরোগ জীবন লাভের সম্ভাবনাও দৃঢ় হয়।

শুধু কি তাই? এই খেলাধুলার মধ্য দিয়েই তারা শিখতে পারে নিজের মতো করে একটা দল তৈরি করা ও তার নেতৃত্ব দেওয়া। অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলা করার শিক্ষা বাচ্চারা পায় খেলার মাঠেই।

অন্যদিকে যে বাচ্চারা খেলাধুলা করে না বা তা করার সুযোগ পায় না, তারা সাধারণত ঘণ্টার পর ঘণ্টা টিভি দেখে, কম্পিউটার ঘাঁটে বা মোবাইলে গেম খেলে। যত দিন যাচ্ছে, টিভি ও মোবাইলের প্রতি বাচ্চাদের এই আশক্তি বাড়ছে। এমনটা দেখলে শুরুতেই সাবধান হতে হবে। কারণ এতে ক্রমশ তারা আত্মকেন্দ্রিক, অসহনশীল ও অসামাজিক হয়ে পড়ছে। তাদের সার্বিক বুদ্ধির বিকাশেও বাধা পড়ছে।

এখন চারদিকে তাকালেই দেখা যায় ইট, বালি, পাথরের জঙ্গল। খোলা মাঠ আর পার্কের অভাবে আটকা পড়ছে বাচ্চাদের উচ্ছল প্রাণবন্ত শৈশব। কংক্রিটের আড়ালে একে একে হারিয়ে যাচ্ছে সবুজ। রাতারাতি উধাও হয়ে যাচ্ছে খেলার মাঠ। আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব পেডিয়াট্রিক্সের সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে, শিশুদের টিভি দেখা ও মোবাইল ঘাঁটার সঙ্গে যে অসুখটির সখ্যতা রয়েছে তা হ'ল ডায়াবেটিস। দিনে ৩ ঘণ্টার বেশি টিভি বা মোবাইলের স্ক্রিনে চোখ রাখলে ভয়ংকর ক্ষতি হয় শিশুস্বাস্থের।

নিউক্লিয়ার পরিবারের ফাঁদে দাদু-দিদা-ঠাকুমারা এখন তফাতে। এর ফলে একাকিত্বে ভুগতে হচ্ছে বাচ্চাদের। হারিয়ে যাচ্ছে কল্পনাশক্তি। সেই সঙ্গে বাড়ছে মাথাব্যথা, চোখব্যথা, চোখ দিয়ে জল পড়া তথা দৃষ্টিশক্তি হারানোর সম্ভাবনা। এছাড়াও নানান সমস্যার শিকার হচ্ছে আজকালকার বাচ্চারা। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে বাড়ির একচিলতে মেঝে বা ছাদ যাতে ওদের খেলাঘর হয়ে উঠতে পারে। ছোটখাটো মাঠ কিংবা কাছেপিঠে কোনও পার্ক, যেখানে হাত পা ছুড়ে খেলা করতে পারবে বাচ্চারা। টিভি, মোবাইল বা ভিডিও গেমের নেশায় আর বাঁধা পড়বে না কচিমন। এর জন্য প্রয়োজন একটু মনোযোগ। আমরা সবাই কিছুটা সচেষ্ট হলেই সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণ হবে বাচ্চাদের।

উত্তরণ

যুগশঙ্খ SUPPLI

মঙ্গলবার, ১৮ জুলাই ২০১৭

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

প্রথম পাতার পর

কারণ, এখনকার দিনের পড়ুয়াদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ খুব বেশি নেই। নিজে থেকে পড়ার তাগিদটা তাদের মধ্যে খুব একটা দেখি না। তাই এই সময় আমাদেরও দায়িত্ব বর্তায় তাদের ওপর একটু কড়া মনোভাব দেখানো। তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এই রকম সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

তোমাদের প্রিয় 'উত্তরণ'-এ **'আমার স্কুল'** বিভাগের জন্য তোমরা তোমাদের স্কুল সম্পর্কে লিখে জানাও, লিখে জানাও স্কুলের টিচাররা পড়াশোনায় তোমাদের কীভাবে সাহায্য করেন। সঙ্গে পাঠিও তোমার ও তোমার স্কুলের ছবি। খাতায় লিখে বাড়ির বড়দের বলবে ইউনিকোড হরফে (যেমন অভ্র) টাইপ করে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইল (.doc) মেল করে দিতে বলো। মেল করার সময় মেল-সাবজেক্ট লিখে দিতে বোলো 'CONTENT FOR AAMAR SCHOOL'
মেল আইডি:
jugasankha.suppli@gmail.com

ক্লাস সেভেন-এর টিউশন: ইতিহাস

পাল ও সেন যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতি

আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় পাল ও সেন যুগের শিক্ষা, শিল্প ও ভাস্কর্য।

পাল শাসকদের আমলে বাংলা ও বিহারে শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছিল। বৌদ্ধদের প্রভাব ছিল অনেক বেশি। নালন্দা, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীল, সোমপুরী, জগদ্দল, বিক্রমপুরী প্রভৃতি ছিল বৌদ্ধ দার্শনিকদের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। অষ্টম-নবম শতকে শান্তরক্ষিত, শান্তিদেব, কম্বলপাদ ও শবরীপাদ এবং দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, গোরক্ষনাথ ও কাহ্নপাদ ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

পালযুগের শিল্পরীতি গুপ্তযুগের শিল্পরীতির উত্তরসূরি। এটিকে প্রাচ্য শিল্পরীতি বলে। এইসময় বৌদ্ধরা অনেক স্তূপ তৈরি করেছিলেন। সেগুলি বিভিন্ন আকৃতির ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় আসরফপুর, রাজশাহির পাহাড়পুর, চট্টগ্রামে, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ভরতপুরে এইসব বৌদ্ধস্তূপের নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে এগুলো মূলত ছিল বৌদ্ধভিক্ষুদের বাসস্থান এবং বৌদ্ধজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দু। সোমপুরী বিহারের গর্ভগৃহ, প্রদক্ষিণপথ, মণ্ডপ, সুউচ্চ স্তম্ভ ছিল উল্লেখযোগ্য।

পাল আমলের ভাস্কর্যগুলির নিদর্শন পাওয়া যায় মূল মন্দিরের গায়ে পাথরের ফলকে খোদিত রাধাকৃষ্ণ, যমুনা, বলরাম, শিব, বুদ্ধ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিতে। পোড়ামাটির শিল্প ছিল স্থানীয় লোকায়ত শিল্পের প্রতীক।

তবে সেন রাজাদের আমলে স্থানীয় গ্রাম্য শাসনব্যবস্থার অবনতি ঘটেছিল। সাধারণ মানুষের জীবন ছিল মোটামুটি স্বচ্ছল। তবে ভূমিহীন ব্যক্তি ও শ্রমিকের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেই প্রাধান্য দিতেন। অব্রাহ্মণ সবাইকে শূদ্র হিসাবে ধরা হতো।

লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার কবি জয়দেবের 'গীত গোবিন্দম' কাব্যের বিষয় ছিল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। রাজসভার আরেক কবি ধোয়ী লিখেছিলেন 'পবনদূত কাব্য'। বল্লাল সেন এবং লক্ষ্মণ সেন দু'জনেই সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বল্লাল সেনের লেখা চারটি বইয়ের মধ্যে 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' উল্লেখযোগ্য।

তুলনা: বাংলায় পাল শাসন ৪০০ বছরেরও বেশি স্থায়ী হলেও সেন শাসন মাত্র ১০০ বছরের কিছু বেশি সময় স্থায়ী হয়েছিল। পাল রাজা গোপাল জনসমর্থন নিয়ে রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু বিজয়সেনের সেরকম কোনও জনসমর্থন ছিল না। শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্মচর্চা ও শিল্পকলায় সেন যুগের থেকে পাল যুগ অনেক বেশি এগিয়ে ছিল।

ভারত ও বহির্বিশ্ব: খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের সংস্কৃতিতে নানা বৈচিত্র দেখা যায়। পূর্ব এশিয়া, তিব্বত এবং চিনে ভারতীয় সংস্কৃতির নমুনা পাওয়া যায়। ইসলামীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, সংগীত প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। ভারতীয় শিল্প, ভাষা এবং সাহিত্যচর্চা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। ইন্দোনেশিয়ার বোরোবুদুর-এর বৌদ্ধ মন্দির পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল। দ্বাদশ শতকের প্রথমদিকে কম্বোডিয়ার আঙ্কোরভাটে বিখ্যাত বিষ্ণু মন্দির তৈরি হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সমাজ, শিল্প, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে পারস্পরিক লেনদেনের ফলে এদেশে এক বৈচিত্রময় সংস্কৃতির ছোঁয়া লেগেছিল।

সেন যুগের সাহিত্য ও সমাজ: সাহিত্য হল সমাজের আয়না। রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার কবিদের লেখা কাব্যে ধনী ও বিলাসী জীবনের ছবি ফুটে ওঠে। তাঁদের রচনায় গ্রামের সম্পন্ন কৃষকদের জীবনযাত্রার ছবি ধরা পড়ে। অন্যদিকে সাহিত্যে ধরা পড়েছে গরিব মানুষের জীবনের ছায়া। কবিদের বিভিন্ন লেখায় কাতর শিশু, ছেঁড়া কাপড়, ভাঙা কলসি— এইসব দৃশ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। চরম দারিদ্র্যের অন্যতম নিদর্শন পাওয়া যায় চর্যাপদের একটি কবিতায়— 'হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্য উপবাস।'

মনে রেখো:

নালন্দা: খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে আজকের বিহার রাজ্যে নালন্দা বৌদ্ধবিহার তৈরি হয়েছিল। সুদূর তিব্বত, চিন, কোরিয়া, মোঙ্গোলিয়া থেকে ছাত্ররা এখানে আসত পড়াশোনার জন্য। হিউয়েন সাঙ এই বিহারে শিক্ষালাভ করেন। হর্ষবর্ধন ও পাল রাজারা নালন্দা বিহারকে নানাভাবে সাহায্য করেন। সমগ্র এশিয়ায় নালন্দার শিক্ষা-দীক্ষার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

বিক্রমশীলা: খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে মগধের উত্তরভাগে আধুনিক ভাগলপুরের কাছে বিক্রমশীলা মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বৌদ্ধ ধর্মচর্চা ও শিক্ষার জন্য একশোরও বেশি আচার্য ছিলেন। এখানে তর্কশাস্ত্র, দর্শন, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হত। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন এই মহাবিহারের অন্যতম একজন মহাচার্য।

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান: বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন অতীশ। আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান হন। তিনি দুর্গম হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তিব্বতে তিনি বুদ্ধর অবতার হিসাবে পূজিত হন।

চর্যাপদ: খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকে লেখা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের কবিতা ও গানের সংকলনকে 'চর্যাপদ' বলে। আদি বাংলা ভাষার নিদর্শন হল 'চর্যাপদ'। নেপাল থেকে এই পুথি উদ্ধার করেন আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ক্লাস এইট-এর টিউশন: ইতিহাস

ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন প্রকরণ

পিট প্রণীত আইনের ফলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপের উপর ব্রিটেনের পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় হয়েছিল। ফলে, ব্রিটেনের উপনিবেশ হিসাবে ভারতীয় উপমহাদেশের সম্পদ ব্রিটিশ-স্বার্থে পরিচালিত করার উদ্যোগ জোরদার হয়। পাশাপাশি ভারতীয় উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসন যত বাড়ল ততই তাকে চালানোর জন্য সম্পদের দরকার হল। আর সেই কারণে শাসন চালানোর জন্য প্রয়োজন হল দক্ষ শাসনযন্ত্রের। গোটা দেশে কোম্পানি অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে একইরকম শাসন চালু করা হয়। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানি ভারতীয় শাসকদের মতো করে শাসন চালাত। কিন্তু পরিস্থিতি বদলাতে থাকে, তাই সুষ্ঠু শাসনের জন্য ঔপনিবেশিক শাসন যন্ত্রকে ঢেলে সাজানোর দরকার হয়ে পড়েছিল। বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি পুলিশ ও সেনাব্যবস্থা এবং আমলাতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে সেই ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র বাস্তবায়িত হয়েছিল।

পুলিশ ব্যবস্থা

মুঘল পুলিশ ব্যবস্থায় ফৌজদার, কোতোয়াল, চৌকিদারদের ক্ষমতা বেশি ছিল। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন দেওয়ানি লাভ করে তখনও এই ব্যবস্থাই চালু ছিল। কিন্তু ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মন্বন্তরের ফলে সামাজিক আইনশৃঙ্খলার অবনতি দেখা দেয়। সেই ক্ষেত্রে মুঘল আমলে পুলিশি ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী ছিল না। তাই পুলিশ ব্যবস্থাকেও ইউরোপীয় তদারকির অধীনে ঢেলে সাজানোর দরকার হয়ে পড়েছিল। ক্রমশ বাড়তে থাকা আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঔপনিবেশিক শাসনের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল না।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস জেলাগুলির দেখভাল করার জন্য পুলিশ থানা ব্যবস্থা চালু করেন। প্রতিটি থানার দায়িত্ব পায় দারোগা। তাদের নিয়ন্ত্রণ করত ম্যাজিস্ট্রেটরা। স্থানীয় অঞ্চলে সাধারণ মানুষের কাছে দারোগারাই ছিল কোম্পানি শাসনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতীক। স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে দারোগারা সমঝোতা করে চলত। ফলে সাধারণ মানুষের উপর চলত জমিদার ও দারোগার যৌথ পীড়ন। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে পাকাপাকিভাবে দারোগা ব্যবস্থার বিলোপ করা হয়। তার বদলে কালেক্টরের উপরে দেওয়া হয় গ্রামের দেখভালের দায়িত্ব। ফলে রাজস্ব আদায় আর আরক্ষার দায়িত্ব আবার একজনের হাতেই চলে যায়।

ব্রিটিশ কোম্পানির মূল লক্ষ্য ছিল পুলিশি ব্যবস্থার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। সেই উদ্দেশ্যে পুলিশি ব্যবস্থার নানারকম সংস্কার করা হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশ অঞ্চলে নতুন ধাঁচের পুলিশি ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়। ক্রমে আলাদা পুলিশ আইন বানানো হয়।

সেনাবাহিনী

প্রাথমিকভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের যে কোনও বিরোধিতার মোকাবিলা করত পুলিশবাহিনী, তবে পরিস্থিতি ঘোরতর হয়ে উঠলে প্রয়োজন পড়ত সেনাবাহিনীর। সেই কারণে ভারতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে বেড়ে উঠেছিল কোম্পানির সেনাবাহিনী। শুরুর থেকেই স্থায়ী সেনাবাহিনী তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল কোম্পানি। সেক্ষেত্রে মুঘল সেনা নিয়োগের পরম্পরা অনুসরণ করেছিল ব্রিটিশরা। উত্তর ভারতে কৃষকদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হতো। এমনকী সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা করে রাখা হতো। সেই প্রথা মেনেই কোম্পানি নিজের ভারতীয় সেনা বা সিপাহিবাহিনী তৈরি করেছিল।

ঔপনিবেশিক শাসক সামরিক খাতে সবথেকে বেশি খরচ করত। কোম্পানির হয়ে এলাকা দখলের পাশাপাশি বিভিন্ন বিদ্রোহের মোকাবিলা করাও সিপাহিদের কাজ ছিল। প্রথমদিকে সেনাবাহিনীতে প্রচলিত জাতভিত্তিক ধারণাগুলির বিরোধিতা কোম্পানি করেনি। ফলে সিপাহিবাহিনীতে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ও রাজপুত কৃষকরা সহজেই জায়গা করে নিত। এইসব লোকেরা সিপাহিবাহিনীতে জাতভিত্তিক মনোভাব দেখতে থাকে। পরে সেনাবাহিনীর কাঠামোয় বেশ কিছু বদল দেখা দিতে থাকে। মারাঠা, মহীশূর অঞ্চলের পাহাড়ি উপজাতি ও নেপালি গোর্খাদের নিয়োগ শুরু হয়। ফলে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ও রাজপুত কৃষকদের সুযোগ-সুবিধা কমতে থাকে। এর ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হতে থাকে।

আমলাতন্ত্র

অসামরিক শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসকের প্রধান হাতিয়ার ছিল আমলাতন্ত্র। তবে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমলাদের স্বাধীনতা ছিল না। ইংরেজ সরকারের গৃহীত নীতিগুলি প্রয়োগ করাই ছিল আমলাদের কাজ। কোম্পানি শাসনের অধীনে আমলাতন্ত্রকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে লর্ড কর্নওয়ালিস সিভিল সার্ভিস বা অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করেন। ব্রিটিশ প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল কর্নওয়ালিসের। তাঁর ধারণা ছিল, উপযুক্ত বেতন না পাওয়ার ফলেই কোম্পানির কর্মচারীরা সততা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে না। চাকরির পাশাপাশি চাকরির মেয়াদের ভিত্তিতে সিভিল সার্ভেন্টদের পদোন্নতির ব্যবস্থা চালু করেন কর্নওয়ালিস। লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় থেকেই সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের নিয়োগ করা বন্ধ হয়।

প্রত্যেক স্কুলের ফার্স্টবয় ও ফার্স্টগার্ল-রা 'রোল নং ওয়ান' বিভাগে যোগ দিতে পারো।
ফোন: 033 40605837 (১২টা থেকে ৬টা), ই-মেইল: jugasankha.suppli@gmail.com

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৮ জুলাই ২০১৭

ক্লাস নাইন-এর টিউশন: ভৌতবিজ্ঞান

প্লবতা ও পদার্থের অন্যান্য ধর্ম

আজ আমরা প্লবতা, ঘনত্ব ও আপেক্ষিক ঘনত্ব নামে পদার্থের তিনটি বৈশিষ্ট্যের সম্পর্কে জানব।

প্লবতা: কোনও বস্তুকে কোনও প্রবাহী বস্তু যেমন জলের মধ্যে আংশিক বা সম্পূর্ণ ডোবালে ওই বস্তুটার ওজনের আপাত হ্রাস ঘটে। কারণ বস্তুটাকে তরল একটা ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে। ফলে বস্তুটিকে হালকা মনে হয়। এই ঊর্ধ্বমুখী বলকেই প্লবতা বলে। সেই জন্যই সুইমিং পুলে সাঁতার কাটার সময় আমাদের শরীর হালকা লাগে। আমরা কুয়োর মধ্যে যখন বালতি ফেলি তখন বালতিটা হালকা মনে হয়, কিন্তু যখনই বালতিটা জলের থেকে তোলা হয় তখনই বালতিটা ভারী মনে হয়। এর কারণও সেই প্লবতা। এই প্লবতার মান হয় বস্তুর দ্বারা আপসারিত প্রবাহী বস্তুর মানের সমান।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন।

আর্কিমিডিসের নীতি: কোনও বস্তুকে স্থির প্রবাহীতে (তরল বা গ্যাসে) আংশিক বা সম্পূর্ণ ডোবালে ওই বস্তুর ওজনের আপাত হ্রাস ঘটে এবং এই হ্রাস বস্তু যে পরিমাণ প্রবাহী অপসারণ করে তার ওজনের সমান হয়।

বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস এই নীতি প্রমাণ করেন। তাই এর নাম আর্কিমিডিসের নীতি (Archimedes's Principle)। এই সংজ্ঞাতে ব্যবহৃত কিছু শব্দের অর্থ এবার বিশদে জেনে নিতে হবে।

প্রবাহীতে বস্তুর ওজনের আপাত হ্রাস: এমনি সময় বস্তুর নিজের ওজন নীচের দিকে ক্রিয়া করে কিন্তু প্রবাহীতে বস্তুর ওজন উপরের দিকে ক্রিয়া করে। ফলে তার ওজনের আপাত হ্রাস ঘটে এবং আপাত হ্রাস ওজন ততটাই হয় যতটা সে প্রবাহী অপসারণ করে।

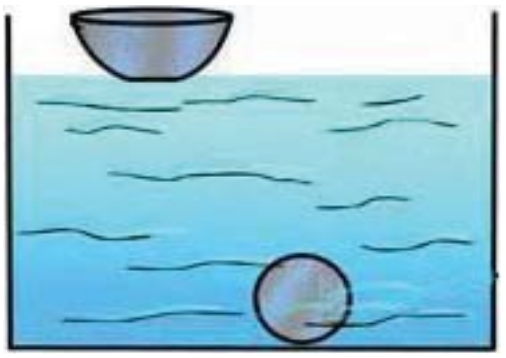

প্রবাহীতে বস্তুর অবস্থান: কোনও বস্তুর ওজন যদি প্রবাহীর ওজনের থেকে বেশি হয় তবে তার ওজন নীচের দিকে কাজ করবে এবং বস্তুটা আস্তে আস্তে ডুবে যাবে। আবার এভাবেও

বলা যায় যে বস্তুর ঘনত্ব যদি তরল বা গ্যাসের ঘনত্বের থেকে বেশি হয় তাহলে তা ডুবে যাবে। যেমন একটা পাথরের টুকরোকে জলের মধ্যে ফেললে তা ডুবে যায়। কিন্তু একটা কাঠের টুকরোকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে তা ভেসে উঠবে কারণ তার ঘনত্ব জলের ঘনত্বের থেকে কম।

সাম্যাবস্থায় ভাসন: জলের মধ্যে এক টুকরো কাঠ বা কর্ককে ডুবিয়ে দিলেও তা ভেসে ওঠে, কারণ নিমজ্জিত অবস্থায় প্লবতার ঊর্ধ্বমুখী বল কাঠ বা কর্কের ওজনের থেকে বেশি তাই ওটা ওপরের দিকে উঠে আসে। টুকরোটির কিছু অংশ জলের বাইরে এলে তার দ্বারা অপসারিত জলের পরিমাণও কমে, তাই প্লবতাও কমে। টুকরোটি যখন অর্ধেক ডুবন্ত অবস্থায় থাকে তখন অপসারিত জলের পরিমাণ আর টুকরোটির ওজন সমান হয়, তাই টুকরোটি অর্ধেক জলের ভেতরে আর অর্ধেক জলের বাইরে থেকে স্থির হয়ে ভাসে— এটাকেই বলে সাম্যাবস্থা। এই অবস্থায় টুকরোটি জলের মধ্যে ডুবেও যায় না, উপরের দিকে উঠেও আসে না আবার ওর মধ্যে ঘূর্ণনও হয় না। তাই এটিকে সাম্যাবস্থা বলে।

একটি বস্তুর স্থির হয়ে ভাসার পেছনে দু'টি কারণ থাকে:

১. প্রবাহীতে ভাসমান বস্তু নিজের ওজনের সমান ওজনের প্রবাহী অপসারণ করবে।

২. বস্তুর ভারকেন্দ্র ও প্লবতার কেন্দ্র একই উলম্ব রেখায় থাকবে।

ভাসমান বস্তুর কোনও আপাত ওজন থাকে না। বস্তুর ওজন এবং অপসারিত প্রবাহীর ওজন সমান ও বিপরীতমুখী হওয়ায় একে অপরকে প্রশমিত করে। ফলে ভাসমান অবস্থায় বস্তুটির কোনও আপাত ওজন বোঝা যায় না।

ঘনত্ব ও আপেক্ষিক ঘনত্ব: কোনও বস্তু কতটা ভারী বা হালকা তা বোঝা যায় তার ঘনত্বের সাহায্যে।

ঘনত্ব: কোনও পদার্থের একক আয়তনের ভরকে সেই নির্দিষ্ট উষ্ণতায় সেই পদার্থের ঘনত্ব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। উষ্ণতা অনুযায়ী পদার্থের ঘনত্বের পরিবর্তন হয়, তাই ঘনত্ব উল্লেখ করার সময় অবশ্যই উষ্ণতার উল্লেখ করতে হয়।

আপেক্ষিক ঘনত্ব বা গুরুত্ব: কোনও পদার্থ অন্য কোনও পদার্থের তুলনায় কতটা ভারী বা হালকা তা বোঝার জন্য পদার্থের ঘনত্বকে জলের ঘনত্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এইভাবেই আপেক্ষিক ঘনত্বের হিসাব করা হয়। কোনও বস্তুখণ্ডের ওজন ও ৪ ডিগ্রিতে সম-আয়তন জলের ওজনের অনুপাতকে ওই বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব বলে। এই আপেক্ষিক ঘনত্ব বা গুরুত্ব তাই একটি সংখ্যা এর কোনও একক নেই।

ঘনত্ব ও আপক্ষিক গুরুত্বের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

১. দু'টি বিষয়ের অর্থই পৃথক।

২. ঘনত্বের একক এসআই-তে $kg\ m^{-3}$, আর সিজিএস-এ $g\ cm^{-3}$। কিন্তু আপেক্ষিক গুরুত্বের কোনও একক নেই। আমরা জানি যে এটি একটি সংখ্যা।

৩. পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতিতে ঘনত্বের মান আলাদা হয়। কিন্তু আপক্ষিক ঘনত্ব একটি স্থির সংখ্যা। এর কোনও পরিবর্তন নেই।

ক্লাস টেন-এর টিউশন: জীবন বিজ্ঞান

সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জনন

আমরা আগেই জেনেছি জননের মাধ্যমে প্রাণী নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করে। উদ্ভিদের দু'টি বংশবিস্তারের প্রক্রিয়া অযৌন জনন আর অঙ্গজ জনন সম্পর্কে আমরা আগেই জেনেছি। আজ আমরা সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জনন সম্পর্কে জানব।

পরাগ মিলনের মাধ্যমে সপুষ্পক উদ্ভিদ তাদের যৌন জনন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে। কোনও সপুষ্পক উদ্ভিদের পুংকেশরের মধ্যে অবস্থিত পরাগধানীর পরাগ যখন কীটপতঙ্গ, বাতাস বা জলের মাধ্যমে গর্ভকেশরের গর্ভমুণ্ডে এসে মিলিত হয় তখন তাকেই পরাগ মিলন বলে। সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জননের এটিই একমাত্র পদ্ধতি। আবার বলা যায় এই পরাগ মিলন একমাত্র সপুষ্পক উদ্ভিদেই সম্ভব।

এইক্ষেত্রে গাছের ফুলের প্রতিটি অংশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই প্রথমেই আমাদের জেনে নেওয়া দরকার ফুলের গঠন। সাধারণত একটি আদর্শ ফুলের চারটি অংশ থাকে। তারা হল বৃতি, দলমণ্ডল, পুংকেশর, গর্ভকেশর।

বৃতি: বৃতি ফুলকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। এটি সাধারণত সবুজ রঙের হয়। এই বৃতির ছোট ছোট প্রতিটি অংশকে বৃত্যাংশ বলে। এর কাজ হল মুকুল অবস্থায় ফুলকে রক্ষা করা ও সালোকসংশ্লেষে সাহায্য করা।

দলমণ্ডল: এই দলমণ্ডলই আসলে পাপড়ি। বৃতির ভিতরে এর অবস্থান। এটি ফুলের পুং ও স্ত্রী স্তবককে রক্ষা করে। এর নীচে থাকে মধু যা পতঙ্গদের আকৃষ্ট করে পরাগ মিলন ঘটায়।

পুংকেশর: পুংস্তবকের মধ্যে ছোট ছোট অংশকে পুংকেশর বলে। পাপড়ির মধ্যে এর অবস্থান। এতে মিয়োসিস পদ্ধতিতে পরাগরেণু তৈরি হয় যা জননে সাহায্য করে।

গর্ভপত্র বা স্ত্রী স্তবক: এটি ফুলের সবথেকে ভিতরের অংশ। স্ত্রী স্তবকের প্রত্যেক অংশকে গর্ভকেশর বলে। এখানে পরাগমিলন হয়।

পরাগযোগ: জননের প্রাথমিক পদ্ধতি হল পরাগযোগ। পুংকেশরের ভিতরে থাকা পরাগধানীর পরাগরেণু নানা কারণে গর্ভপত্রের গর্ভদণ্ডের উপর থেকে গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়। একেই পরাগযোগ বলে। এই পরাগযোগের আবার কিছু ধরন আছে, সেগুলি হল—

১) স্বপরাগযোগ—যখন একই ফুলের মধ্যে পরাগরেণু পরাগধানী থেকে গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়ে জনন ঘটায়, তখন তাকে স্বপরাগযোগ বলে। দোপাটি ফুলে এটি দেখা যায়। তবে দু'টি আলাদা গাছে একই প্রকৃতির ফুল থাকলে তাদের মধ্যেও স্বপরাগযোগ হতে পারে। মজার বিষয় হল, এতে বাহক লাগে না। একই ফুলের মধ্যে এটি ঘটলে তাকে অটোগ্যামি বলে। আর একই গাছের দু'টি আলাদা ফুলের মধ্যে হলে একে জিটোনোগ্যামি বলে।

২) ইতর পরাগযোগ— এই জনন প্রক্রিয়া সাধারণত দু'টি আলাদা উদ্ভিদের মধ্যে হয়ে থাকে। তার মানে এক উদ্ভিদের পরাগরেণু অপর কোনও উদ্ভিদের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়ে জনন ঘটালে তাকে ইতর পরাগযোগ বা অ্যালোগ্যামি বলে। আকন্দ গাছে এই প্রকার জনন হয়ে থাকে। এই জনন দু'ভাবে হতে পারে—এক হল, একই প্রজাতির দু'টি আলাদা উদ্ভিদের মধ্যে হলে তাকে জেনোগ্যামি বলে, আবার দুটি আলাদা প্রজাতির আলাদা গাছের মধ্যে হলে তাকে হাইব্রিডাইজেশন বলে।

তবে এই পরাগযোগে বাহকের ভূমিকাকে ভুললে চলবে না। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। যেমন বায়ুর দ্বারা ধান ও গমের জনন হয়, পাতা-শেওলা গাছের জননে জল সাহায্য করে আবার আম, হাসনুহানা এই সব গাছের জনন কীট বা পোকার মাধ্যমে হয় আর পাখি শিমুল, পলাশ এই সব গাছের জনন ঘটায়।

নিষেক বা নতুন উদ্ভিদ গঠন

পরাগযোগের পর নিষেক হয়ে নতুন উদ্ভিদ জন্ম নেয়। যেভাবে একটি হ্যাপ্লয়েড স্ত্রী ও একটি হ্যাপ্লয়েড পুং জনন কোষ মিলে ডিপ্লয়েড জাইগোট তৈরি হয়, তাকে নিষেক বলে। এবার আমরা জেনে নিই এই নিষেক প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে কীভাবে এগোয়।

প্রথমে একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের পরাগনালি থেকে পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে স্থাপিত হয়। এভাবেই পরাগযোগ ঘটে। এবার পরাগরেণু ধীরে ধীরে পরাগনালি তৈরি করে, যার ভিতরে পুং জননকোষ থাকে। এই কোষ নিয়ে গর্ভনালি গর্ভদণ্ডের ভিতর দিয়ে ডিম্বাশয়ের কাছে পৌঁছয়। তারপর সেখান থেকে ডিম্বকের কাছে যায়। এখানে স্ত্রী ও পুং জনন কোষ মিলিত হয়, যাকে বলে নিষেক। যার ফলে ডিপ্লয়েড জাইগোট তৈরি হয়। এই জাইগোট ভেঙে গিয়ে ডিম্বকের ভিতরে ভ্রূণ তৈরি হয়। ধীরে ধীরে এই ডিম্বক হয় বীজ আর ডিম্বাশয় বড় হয়ে ফলে পরিণত হয়। বীজের মধ্যে আগামী দিনের গাছ মানে ভ্রূণ থাকে, অনুকূল পরিবেশ পেলে যেমন, উপযুক্ত জল, বাতাস, মাধ্যম, উষ্ণতা ইত্যাদি, তার থেকে আবার নতুন গাছের জন্ম হয়।

এইভাবেই সপুষ্পক গাছেরা তাদের বংশবিস্তার যৌন জনন প্রক্রিয়ায় করে।

যুগশঙ্খ SUPPLI team
উত্তরণ
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিদিশা রায়চৌধুরী** (কো-অর্ডিনেটর, অসম), **সালমা আহমেদ**, **বিপাশা চক্রবর্তী**

একঘেয়েমি কাটাতে পড়াশোনার মাঝে ছবি আঁকতে পারো, গল্প ও ছড়া লিখতে পারো। দেখবে পড়াশোনায় আরও আগ্রহ পাবে। আর হ্যাঁ, রবিবারের সাহিত্যের ক্রোড়পত্রে এখন থেকে তোমাদের জন্যও 'ছোটদের বৈঠক' নামে একটা পাতা থাকছে। সেখানেও তোমরা তোমাদের আঁকা, গল্প, ছড়া-কবিতাগুলো মেল করে পাঠিয়ে দিতে পারো। ছেপে বেরোলে দেখবে কত ভালো লাগবে তোমাদের।

তরঙ্গ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৮ জুলাই ২০১৭

হিম জগতের প্রাণী

আন্টার্কটিকা মহাদেশের কথা আমরা কে না শুনিনি। এটি বিখ্যাত বরফ আর ঠান্ডার জন্য। সূর্যের আলো এখানে ঠিকভাবে পৌঁছয় না, তাই হিমের দেশ অর্থাৎ আন্টার্কটিকায় প্রানের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এই মহাদেশের শতকরা ৯৮ শতাংশ অঞ্চল ৩-৪ কিমি পুরু বরফে ঢাকা। আন্টার্কটিকাতে কিছু নিম্ন প্রকৃতির উদ্ভিদ দেখা যায় ঠিকই কিন্তু তা কুমেরু উপবৃত্তের বাইরে আন্টার্কটিকা উপদ্বীপে বা এর সংলগ্ন এলাকাগুলোতে। কারণ এখানে গড় তাপমাত্রা তুলনামূলক বেশি। যেহেতু প্রাণী কোনও না কোনওভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল হয় তাই এখানে উদ্ভিদের সংখ্যা কম হওয়ায় প্রাণীর সংখ্যাও কম। এর বাইরে মস, অ্যালগি, লাইকেন জাতীয় উদ্ভিদ ছাড়া আর কোনও প্রাণের অস্তিত্ব সেভাবে নেই বললেই চলে।

আন্টার্কটিকায় পেঙ্গুইন, সিল এবং পাখিরা যেহেতু সামুদ্রিক প্রাণীর উপর নির্ভর করে রসনা পূর্তির জন্য তাই তারা জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটায় সমুদ্রের ধারে, তাই এদের সামুদ্রিক প্রাণী বলাই ভালো। এদের বাদ দিলে কিছু নিম্নশ্রেণির কীটপতঙ্গ ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। এই কীটপতঙ্গের মধ্যে আবার বেশিরভাগই উকুন জাতীয় পরজীবী যারা পেঙ্গুইন বা সিলের শরীরে বসবাস করে। এগুলোকে বাদ দিলে থাকে কিছু পাখাবিহীন মাছি আর স্প্রিংটেল জাতীয় ক্ষুদ্র জীব। এদের বেশিরভাগেরই খাদ্য হচ্ছে লাইকেন। তবে এইসব প্রাণী ও বেশিরভাগ থাকে আন্টার্কটিকা মহাদেশের কুমেরু বৃত্তের বাইরে।

এই মহাদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হল আন্টার্কটিকা সমুদ্রের। কারন এখানের মতো প্রাণের অস্তিত্ব অন্য কোথাও দেখা যায় না। এই আন্টার্কটিকা সমুদ্রের মতো এত বিপুল পরিমাণে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, শর্করা, চর্বি অন্য কোনও সমুদ্রে দেখা যায় না। এর কারণ হল এর প্রচণ্ড ঠান্ডা জল। এর জল প্রচন্ড ঠান্ডা হওয়ার কারনেই এই সমুদ্রের জল প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে। জলের এই উর্বরতার কারণে এখানে উদ্ভিদ প্লাংকটনের পরিমাণ প্রচুর বেশি। এই উদ্ভিদ প্লাংকটন আবার প্রাণী প্লাংকটনের খাদ্যের জোগান দেয়। ফলে এই সমুদ্রে লক্ষ কোটি প্রাণী প্লাংকটন জন্মায়। এর মধ্যে পড়ে নানা জাতীয় ছোট প্রাণী, আন্টার্কটিকার বিখ্যাত ক্রিল প্রজাতির চিংড়ি মাছ। এই ক্রিলই আবার পেঙ্গুইন, সিল এদের খাদ্য। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন ঠান্ডায় প্রাণীদের আয়ু বাড়ায়, তাই এখানে প্রজাতির সংখ্যা খুব বেশি না হলেও প্রাণের সংখ্যা অনেক।

ক্রিল

দক্ষিণ সমুদ্রের খাদ্য তালিকার একেবারে নীচে আছে ফাইটোপ্ল্যাংকটন যেমন ডায়াটম, অ্যালগি ইত্যাদি। এরপরে আছে জুপ্ল্যাংকটন যার মধ্যে প্রধান হল ক্রিল। এই ক্রিল লম্বায় দুই থেকে তিন ইঞ্চি, গায়ের রং কমলা। এই মাছটি দক্ষিণ সমুদ্রের অধিকাংশ প্রাণীর প্রধান খাদ্য। এক কেজি ক্রিলে খাদ্যপ্রাণ আছে প্রায় ১২০০ ক্যালোরি। এই ক্রিলের শরীরের পিগমেন্ট দিয়ে আবার আলসারের ওষুধ তৈরি হয়। ক্রিল শুধুমাত্র দক্ষিণ সমুদ্রেই পাওয়া যায়। একটা তিমি দিনে প্রায় ৪ টন ক্রিল খায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এই ক্রিল ধরা শুরু করেছে কিন্তু এর পিছনে চুক্তি আছে। এই চুক্তি হল ক্রিল মাছ ধরা যাবে শুধুমাত্র ৬০ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশের বাইরে কারণ এর বাইরের অঞ্চল সংরক্ষিত।

আন্টার্কটিকার মাছ

আন্টার্কটিকাতে যত মাছ পাওয়া যায় তার প্রায় ৯০ শতাংশই হল নোটোথেনিড পরিবারের অন্তর্গত। তবে দক্ষিণ সমুদ্রের বাইরে এদের দেখা যায় না। আবার একই প্রজাতির মাছ বড় ও ছোট দু'রকমই দেখা যায়। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হল এই যে কিছু কিছু মাছের রক্তে লোহিত কণিকা নেই, কারণ এই সমুদ্রের জলে এত পরিমাণ অক্সিজেন দ্রবীভূত আছে আর জল এত ঠান্ডা যে মাছের শরীরে বিপাক খুব ধীরে হয়। ফলে এইসব মাছ সরাসরি শ্বাসযন্ত্র থেকে অক্সিজেন নিয়ে রক্তে দ্রবীভূত করতে পারে। আবার কিছু মাছের শরীর এমনভাবে গঠিত যে প্রচণ্ড ঠান্ডাতেও এদের রক্ত জমাট বাঁধে না। এই ক্ষমতা আছে ডিজোটিসাস মাওসিন ও ট্রেমাটোমাস প্রজাতির মধ্যে। দক্ষিণ সমুদ্রের মাছেদের মধ্যে আরও একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে সেটা হল দ্রুত বাড়ার। কিছু মাছ আছে যাদের বয়স হাজার বছরেরও বেশি।

তিমি

ক্যাপটেন কুক প্রথম দক্ষিণ সমুদ্র ভ্রমণ করে এসে সিল ও তিমির প্রাচুর্যের কথা বলেন। এরপর উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে শুরু হয় ব্যাপক হারে তিমি শিকার। ১৯৩৫ সালের রেকর্ডে আছে সেই বছর ৫০,০০০ তিমি শিকার করা হয়েছিল। এইভাবে ক্রমাগত শিকারের ফলে তিমি আজ লুপ্তপ্রায় প্রাণী। এই অনাচার বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক হোয়েলিং কমিশন নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রজাতির তিমি মারার অনুমতি দিয়েছেন এবং তার সংখ্যাও নির্ধারণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্লু, ব্রাইড, হাম্পব্যাক, ও রাইট এই পাঁচ প্রজাতির তিমি মারা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পৃথিবীর অধিকাংশ তিমি বিচরণ করে দক্ষিণ সমুদ্র এলাকায়। গরমকালে এরা আন্টার্কটিকাকে ঘিরে প্রায় ৫০০ কিমির মধ্যে থাকে। শীতকালে এরা আরও উত্তরে চলে আসে। কিছু তিমির চোয়ালে হোয়েলবোন নামের নরম হাড়ের তৈরি ছাঁকনি জাতীয় একটি জিনিস থাকে যার সাহায্যে এরা ছোট মাছ বা ক্রিল ছেঁকে খেতে পারে। এদের মধ্যে অরকা বা রাক্ষুসে তিমি উল্লেখযোগ্য। এরা আকারে ছোট হলেও এরা প্রচণ্ড হিংস্র এবং এদের দাঁত খুব ধারালো। এরা সবসময় দল বেঁধে থাকে। সিল এবং পেঙ্গুইন এদের প্রধান খাদ্য, এরা এতটাই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন যে খাওয়ার সময় এরা মুখে নানারকম আওয়াজ করে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

ব্লু হোয়েল

এই প্রাণী সব প্রাণীদের থেকে শুধু বড় তাই নয়, এরা বর্তমানে সব জীবিত প্রাণীদের মধ্যে সবথেকে বড়। এদের গড় ওজন ৮৪ টন। তবে ১৮০ টনের নীল তিমিও পাওয়া গেছে। এটা একটা রেকর্ড। এদেরকে পৃথিবীর সব সমুদ্রেই কমবেশি দেখা যায় ঠিকই কিন্তু গরমকালে এরা আন্টার্কটিকা বরফের কাছকাছি চলে যায়। পুরো গরমকাল এখানে তো কাটায় বটেই তাছাড়া এখানে এরা প্রজননও করে। কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল পৃথিবীর সব থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেও এই নীল তিমিদের প্রজনন এলাকা বার করতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। এরা খুব লাজুক প্রকৃতির হয় এবং এদের প্রিয় খাদ্য ক্রিল। এদের দেখতে পাওয়া খুব কঠিন এবং মানুষ এদের লুপ্ত করে দিয়েছে। ৫০-এর দশকে প্রায় দু'লক্ষ তিমি মারা হয়েছে। বর্তমানে যদিও আইনের দ্বারা এটি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে কিন্তু গোপনে এই হত্যালীলা আজও চলছে।

ফিন হোয়েল

এরা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাণী। এরা লম্বায় ২০ মিটার এবং এদের ওজন ৪০-৫০ টন পর্যন্ত হয়। তবে মহিলা তিমি আকারে একটু ছোটো হয়। এরা নীল তিমির মতো বেশিদূর ভ্রমণ করে না এবং এরা খোলা জলেই বংশ বিস্তার করে। এদের প্রধান খাদ্য ক্রিল এবং এটিকে খাবার জন্য এরা আন্টার্কটিকা মহাসাগরের সীমায় পৌঁছয়। বর্তমানে এদের সংখ্যা মাত্র ৮০,০০০। ১৯৭৬ সালে আইনের দ্বারা এদের সুরক্ষিত করা হয়েছে।

রাইট হোয়েল

এরা ১৪ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের ওজন হয় প্রায় ৯৬ টন। এদের শরীরের অর্ধেক অংশ জুড়ে থাকে এদের মাথা। তাই এদের মাথা হয় বিশাল আকৃতির। এদের চামড়া হয় খসখসে এবং এদের শরীরে পরজীবীরা বাস করে। এদের প্রধান খাদ্য ক্রিল এবং এরা উপকূলে প্রজনন করে। ১৮৫০ সাল পর্যন্ত এই তিমি প্রচুর পরিমাণে মারা হয়েছিল। বাজারে এর তেল ও হাড়ের চাহিদা বিশাল। বর্তমানে এদের সংখ্যা কত তা নির্ধারণ করা যায়নি এখনও।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৮ জুলাই ২০১৭

ক্যুইজ

১) ক্যানসার সৃষ্টিকারী জিনকে কী বলে?
২) ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজোমে সংখ্যা কত?
৩) মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের নাম কী?
৪) মায়োপিয়া কীভাবে সারানো যায়?
৫) কোন ছিদ্রের মাধ্যমে চোখে আলো প্রবেশ করে?
৬) সংক্রমণযোগ্য ভাইরাস কণাকে কী বলে?
৭) ব্যাকটেরিয়ার জেনেটিক পদার্থকে কী বলে?
৮) মানুষের হাড়ের প্রধান রাসায়নিক উপাদান কী?
৯) বায়ুমণ্ডলে শতকরা কত ভাগ নাইট্রোজেন থাকে?
১০) ভারনালিন কী?
১১) ভলভক্সের গমন অঙ্গের নাম কী?
১২) হিমোসায়ানিন কী ঘটিত প্রোটিন?
১৩) মহাকর্ষীয় তরঙ্গের প্রবক্তা কে?
১৪) সোরার রাসায়নিক নাম কী?
১৫) ফায়ারি আইস কাকে বলে?
১৬) তেজি জল কোন খনিজ অ্যাসিড?
১৭) হিমোগ্লোবিনের ত্রুটির জন্য যে রোগ হয় তাকে কী বলে?
১৮) আয়োডাইজড খাদ্যলবণে আয়োডিনের কোন যৌগ থাকে?
১৯) কোনও কাণ্ড সালোকসংশ্লেষের জন্য প্রসারিত হয়ে ফলকের মতো দেখতে হলে তাকে কী বলে?
২০) ঘোড়ার কোন আঙুল ক্ষুরে রূপান্তরিত হয়েছে?
২১) খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে যে সংগ্রাম দেখা যায় তাকে কী বলে?
২২) মানবদেহের ক্ষুদ্রতম অনাল গ্রন্থিটির নাম কী?
২৩) কোন হরমোন ইনসুলিনের বিপরীত ক্রিয়া করে?
২৪) আর্যরা কোন জাতির বংশধর?
২৫) কাশ্মীর উপত্যকা ও লাদাখের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে কোন গিরিপথ?
২৬)থর মরুভূমির বৃহত্তম হ্রদ কোনটি?
২৭) কোন কোন সাগরে জোয়ার ভাঁটা হয় না?
২৮) যেসব খাল থেকে সারাবছর জলসেচ করা যায়, তাকে কী বলে?
২৯) কোন বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম জিন শব্দটি প্রচলন করেন?
৩০) ক্লোরিনের ক'টি আইসোটোপ আছে?
৩১) কোন শিলার মধ্যে জীবাশ্ম পাওয়া যায়?
৩২) কোন কণাটি নিস্তড়ি আধান যুক্ত?
৩৩) ক্ষেত্রী খনিটি কোন খনিজ পদার্থের জন্য বিখ্যাত?
৩৪) পঞ্চায়েতিরাজ কোন রাজ্যে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়?
৩৫) শ্বাসমূল কোন উদ্ভিদে দেখা যায়?
৩৬) উদ্ভিদের পুষ্টিতে অতিমাত্রিক মৌলিক উপাদান কোনটি?

৩৭) সাঁচী স্তূপ কোন রাজ্যে অবস্থিত?
৩৮) হিমোসায়ানিনের খনিজ উপাদান কী?
৩৯) কোন শ্রেণির রক্তে অ্যান্টিবডি থাকে না?
৪০) ল্যাবাইরিন্থ মানবদেহের কোন অংশে পাওয়া যায়?

উত্তর: ১) অঙ্কোজিন। ২) ১। ৩) পৃথকীভবনের সূত্র। ৪) অবতল লেন্সের ব্যবহারে। ৫) তারারন্ধ্র। ৬) ভিরিয়ন। ৭) জেনোফোর। ৮) ক্যালসিয়াম ফসফেট। ৯) শতকরা ৭৮ ভাগ। ১০) একপ্রকার উদ্ভিদ হরমোন। ১১) সিলিয়া। ১২) তাম্রঘটিত। ১৩) আলবার্ট আইনস্টাইন। ১৪) পটাশিয়াম নাইট্রেট। ১৫) মিথেন হাইড্রেট। ১৬) নাইট্রিক অ্যাসিড। ১৭) হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি। ১৮) পটাসিয়াম আয়োডাইট। ১৯) কোনও কাণ্ড সালোকসংশ্লেষের জন্য প্রসারিত হয়ে ফলকের মতো দেখতে হলে তাকে কী বলে?পর্ণকাণ্ড। ২০) তৃতীয় আঙুল। ২১) আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম। ২২) পিনিয়াল গ্রন্থি। ২৩) গ্লুকাগন হরমোন। ২৪) নর্ডিক জাতির। ২৫) জোজিলা। ২৬) সম্বর। ২৭) ভূমধ্যসাগর ও বাল্টিক সাগরে। ২৮) নিত্যবহ খাল। ২৯) বিজ্ঞানী জোহানসেন। ৩০) দু'টি। ৩১) পাললিক শিলা। ৩২) নিউট্রন। ৩৩) তামা। ৩৪) রাজস্থান। ৩৫) সুন্দরী। ৩৬) ম্যাগনেশিয়াম ৩৭) মধ্যপ্রদেশ। ৩৮) তামা। ৩৯) 'এ বি'। ৪০) অন্তঃকর্ণ।

এডু অ্যাডভাইস

খারাপের থেকে দূরে রাখুন সন্তানকে

ছোট্ট তিতলিকে সেদিন ইংরেজি ম্যাডাম ক্লাসে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন, তিতলি কালকে তোমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হল, তুমি আমাকে দেখলে, অথচ কথা বললে না তো? ম্যাডামের প্রশ্নের উত্তরে তিতলি যা বলল তাতে ম্যাম হতচকিত হয়ে গেলেন। ওইটুকু মেয়েটা সরাসরি বলে দিল, প্রয়োজন মনে করিনি তাই কথা বলিনি। এই কথা শুনে অন্যান্য স্টুডেন্টদের সামনে বেশ বেকায়দায় পড়লেন অপর্ণা ম্যাম। তিতলি ক্লাস ফোরে পড়ে। বয়স আর কত হবে সাত বছর। এই বয়সের একটা মেয়ের মুখে এই ধরনের কথা কি আশা করা যায়? আসলে বাচ্চারা যা শোনে, যা দেখে তাই শেখে।

ক্লাস শেষে ম্যাম টিচারসরুমে গিয়ে অন্যান্য টিচারদের সঙ্গে আলোচনা করে মা-কে ডেকে পাঠালেন।

পরদিন তিতলির মাকে কথাটা জানালেন ম্যাম। পরে তিতলি ডাকার পর ম্যামের সামনে তার মা যখন জিজ্ঞেস করল এই কথা কেন বলেছ? তিতলিও বলল, বাবা সেদিন তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে না বলে শপিং করলে কেন? তখন তুমিও তো বাবাকে বলেছিলে, প্রয়োজন মনে করিনি তাই বলিনি। অপর্ণা ম্যামের কাছে এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল।

আগেই বলেছি, বাচ্চারা যা দেখে, যা শোনে তাই শেখে। এটা তার একটা ছোট্ট উদাহরণ মাত্র। এই বয়সে তাদের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর থাকে। আজকাল বেশিরভাগ বাচ্চাদের কথা শুনলে মনে হয় মুখে যেন কথা তৈরি রয়েছে। কোনও কথা শেষ হওয়ার আগেই উত্তর দিয়ে দেবে। হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা ভালো। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে তার সম্বন্ধে অন্যদের খারাপ ধারণা তৈরি হতে পারে। অনেক সময় কিছু অসংলগ্ন কথাও তাদের মুখে শোনা যায়। এর জন্য বাড়ির বড়দের সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যে কোনও কথা খুব সংযত ভাবে বলা বাঞ্ছনীয়। কারণ ছোট বয়স থেকে একটি শিশু যে ধরনের কথা শুনবে, সেই ধরনের কথাই কথাই বলতে শিখবে। যদিও এখন বাড়ির বড়দের মানে তো বাবা-মা। আর হয়তো তাকে দেখাশোনা করার একজন আয়া। এই চিত্রটা বেশিরভাগ বাড়িতেই দেখা যায়। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বাবার সঙ্গে যদি মা'কেও কজের জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয় তাহলে কার দায়িত্বে নিজের সন্তানকে রেখে যাচ্ছেন তাকেও একটু ভালো করে যাচাই করে নেওয়া দরকার। কারণ দিনের বেশিরভাগ সময়টাই আপনার ছোট্ট সন্তান তার কাছেই থাকে। তার কথাবার্তা, আচার ব্যবহার সবকিছু দেখে তার উপর বাচ্চার দায়িত্ব ছাড়ার প্রয়োজন রয়েছে।

বাচ্চাদের সামনে বাবা-মা'কেও সংযত ভাবে কথা বলতে হবে। সারাদিন কাজের পর বাড়ি ফিরে হয়তো অনেক সময় মুড ঠিক থাকে না। সেই সময় কোনও সমস্যা সামনে এলে হয়তো অনেকেই মাথা গরম করে মুখ ফসকে অনেক কথা বলে ফেলেন। কিন্তু মাথায় রাখাতে হবে আপনার বাচ্চা কিন্তু এত কিছু বোঝে না, সে আপনার মুখে যে কথাটা শুনবে সেটাই অমৃতবাণী বলে মনে করবে। তাই যতই রাগ হোক, মাথা গরম হোক বাচ্চার সামনে নিজেকে কন্ট্রোল করতে হবে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কখনও কোনও বিষয়ে নিয়ে ঝামেলা হলে বাচ্চাদের সামনে সেই বিষয়ে নিয়ে কথা না বলাই ভালো, তাহলে তার উপর খারাপ প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা থাকে। সে যদি দেখে প্রতিনিয়ত তার বাবা-মা'য়ের মধ্যে ঝামেলা, অশান্তি হচ্ছে তাহলে তার মনের উপর চাপ পড়তে পারে। সে হয়তো সেই সময় মুখে কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু মনে মনে গুমরে থাকার ফলে তার মানসিক সমস্যা হতে পারে। এর প্রভাব তার পড়াশোনাতেও পড়ে। এমনকী দেখা যায় এই ধরনের বাচ্চারা দিন দিন অ্যাগ্রেসিভ হয়ে উঠছে। স্কুলে দিদিমণিদের সঙ্গে, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করছে।

এখানে সম্প্রতি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। ধনতেরাসের দিন ঘোলা থানার বিলকান্দা-২ পঞ্চায়েতের পেয়ারাবাগানে এক মর্মান্তিক ঘটনা সকলের মনকে নাড়া দিয়েছে। বাবা-মায়ের অশান্তির জেরে বাড়িতেই সীমা দত্ত(১৬), সুমিতা দত্ত(১৩) দুই বোন আত্মহত্যা করেছে। দীর্ঘদিন ধরে বাবা-মা'য়ের মধ্যে অশান্তি হওয়ায় মা তাদের মামার বাড়িতে এসেই থাকতেন। মাকে হারভাঙা পরিশ্রম করতে দেখতে ভালো লাগত না মেয়েদের। নানা রকম অশান্তি, বাবার উপর অভিমান সবকিছু থেকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে তারা।

সম্প্রতি অনেক পরিবারেই দেখা যায় বয়স্ক বাবা-মা'য়েদের বৃদ্ধাশ্রমে রাখা হচ্ছে। ছেলে-ছেলের বউ কাজে বেরিয়ে যান বাবা-মা'কে কে দেখবে? এই কথা বলে অনেকেই বয়স্ক বাবা-মা'য়েদের জন্য বৃদ্ধাশ্রমকে উপযুক্ত জায়গা বলে মনে করেন। কিন্তু সেই সেই বাড়িতে যদি বাচ্চা থাকে সেই বাচ্চাটা কিন্তু ঠাকুমা-দাদুর কাছে থাকার জন্য অস্থির হয়। উলটোদিকে ঠাকুমা-দাদুরও একই অবস্থা হয়। কিন্তু বাবা-মা'য়েরা হয়তো ভাবেন না এতে ছোট শিশুটির মনে কী প্রভাব পড়ছে। ভাবেন না তাদেরও একটা সময় বয়স হবে।

আবার অনেক পরিবারে দেখা যায় বয়স্ক বাবা বা মাকে বাড়িতে রাখলেও নানা কারণে তাদের বাড়িতে কোণঠাসা করে রাখা হয়। নানা ছুতনাতায় তাদের অকথ্যভাবে কথা শোনাতেই ছাড়ে না অনেকে। এতেই কিন্তু বাচ্চাদের মনের উপর খারাপ প্রভাব পড়ে।

বাচ্চাদের মন ফুলের মতো কোমল। এই মনে যাতে কোনও রকম মলিনতা স্পর্শ করতে না পারে সেটা দেখার দায়িত্ব অবশ্যই বাবা-মা'য়েদের। ছোট থেকে বাচ্চারা ভালো যত কিছুর সংস্পর্শে থাকবে তত সে ভালো ভাবে, সুন্দর ভাবে নিজেকে বিকশিত করতে পারবে। প্রস্ফুটিত করতে পারবে।

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৮ জুলাই ২০১৭

পৃথিবীর শীর্ষ রেইন ফরেস্টগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের

পৃথিবীর ভারসাম্যকে রক্ষা করতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে বনভূমি। তাই বনভূমিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের। কিন্তু মানুষ অত্যাধিক লোভ, লালসার বশে এক অদ্ভুত খেলায় মেতেছে। যথেচ্ছভাবে বনভূমিকে কেটে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। এতে অজান্তে আমরা নিজেরা যে নিজেদের ক্ষতি ডেকে এনে ক্রমশ পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের অযোগ্য করে তুলছি তা বুঝতে পারছি না। এই রকম চলতে থাকলে হয়তো আমরা একদিন এই সবুজ প্রকৃতিকে হারিয়ে ফেলব।

পৃথিবীতে প্রায় ৪ বিলিয়ন হেক্টর (১ হেক্টর=২.৪৭ এর) বনভূমি রয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় ৩০ শতাংশ এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে আছে বনভূমি। আজ থেকে প্রায় ১১ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে কৃষির উদ্ভব হয়। এরপর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ ভাগ বনভূমি ধ্বংস হয়েছে। এর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ বন উজাড় হয়েছে গত দুই শতকে। মানুষ তাদের থাকার জন্য বসবাসযোগ্য স্থান, কৃষিকাজের জন্য জমি, কলকারখানা স্থাপন, কাঠ ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় কারণে বনভূমি উজাড় করছে। বিশেষ একটি সমীক্ষায় জানা গেছে, গত ৫ বছরে পৃথিবীর ৯ কোটি ১০ লাখ একর বন ধ্বংস হয়েছে।

পৃথিবীতে বনভূমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি রাশিয়ায়। এখানে মোট বনভূমির পরিমাণ ৩২ লাখ ৮৭ হাজার ২৪৩ বর্গমাইল। বনভূমির দিক থেকে পৃথিবীর শীর্ষ দশটি দেশ হল: রাশিয়া ৩২,৮৭,২৪৩ বর্গমাইল, ব্রাজিল ২১,০০,৩৫৯ বর্গমাইল, কানাডা ৯,৪৪,২৯৪ বর্গমাইল, যুক্তরাষ্ট্র ৮,৭২,৫৬৪ বর্গমাইল, চিন ৬,৩১,২০০ বর্গমাইল, অস্ট্রেলিয়া ৫,৯৬,৬৭৮ বর্গমাইল, কঙ্গো ৫,২২,০৩৭ বর্গমাইল, ইন্দোনেশিয়া ৪,০৫,৩৫৩ বর্গমাইল, অ্যাঙ্গোলা ৪,০৫,৩৫০ বর্গমাইল এবং পেরু ২,৫১,৭৯৬ বর্গমাইল

এই শীর্ষ দশ দেশের বনভূমি ছাড়াও পৃথিবীতে এমন অনেক বিখ্যাত বনভূমি রয়েছে যা দেশের নামে নয়, বরং নিজ নামেই সুপরিচিত। বর্তমানে পৃথিবীর বনভূমিগুলোর মধ্যে রেইনফরেস্ট সবচেয়ে জনপ্রিয়। পৃথিবীর অধিকাংশ রেইন ফরেস্টেরই বিস্তার কয়েকটি দেশজুড়ে, যেমন: অ্যামাজন রেইনফরেস্ট কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলা, সুরিনাম, ফ্রেঞ্চ গায়ানা, আর্জেন্টিনা, এককথায় দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের বিশাল এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে আছে। কিছুদিন আগে বিখ্যাত এক সংবাদ মাধ্যম পৃথিবীর শীর্ষ দশটি রেইন ফরেস্টের তালিকা করেছে। এগুলো হল:

মানু রেইন ফরেস্ট, পেরু: আমাজনকে পৃথিবীর রেইন ফরেস্টগুলোর রানী বলা হয়, আর মানু রেইন ফরেস্ট হচ্ছে সে রানির মাথার মুকুট। আমাজন বনভূমির যে অংশটুকু পেরুর মধ্যে পড়েছে সেটিকে বলা হয় মানু রেই ফরেস্ট। এ অংশেই আমাজন বনভূমির শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলোর মেলে।

বিন্দি ন্যাশনাল পার্ক, উগান্ডা: আফ্রিকার পশ্চিমাংশে এ গহীন অরণ্য অবস্থিত। বলা হয়ে থাকে যেই এ অঞ্চলে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। পৃথিবীতে যত গরিলা আছে এর অর্ধেকই এ অরণ্যে বাস করে। ধারণা করা হয় বর্তমানে এ প্রজাতির প্রাণীর মাত্র ৬০০ সদস্য বেঁচে আছে।

ফ্রেজার আইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া: এটি বালুভূমি দিয়ে গঠিত পৃথিবীর একমাত্র বনভূমি যা অস্ট্রেলিয়ার কুইনসল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলে ৭০ মাইল দীর্ঘ এক অরণ্য দ্বীপ। ভয়ঙ্কর বন্য কুকুর 'ডিঙ্গো' এ অরণ্যেই বাস করে। প্রায় ২৫০ প্রজাতির পাখির আবাস স্থল এ অরণ্য।

তালমানকা রেইন ফরেস্ট: কোস্টারিকা ও পানামা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ এবং প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের মিলনকেন্দ্রে তালমানকা রেইন ফরেস্টের অবস্থান। এ অরণ্যটির এক অংশ কোস্টারিকা আর অপরটি পানামায় অবস্থিত।

মাউন্ট কুক ন্যাশনাল পার্ক, নিউজিল্যান্ড: এটি পৃথিবীর এমন এক স্থান, যেখানে ধীরগতিতে নেমে আসা হিমবাহের পাশেই রয়েছে উষ্ণ বনভূমি। মাউন্ট কুক ন্যাশনাল পার্ক এরকম বনভূমি যার মধ্য দিয়ে অসংখ্য উষ্ণ ঝরনা বয়ে চলেছে।

সেপিক রেইন ফরেস্ট, নিউগিনি: নিউগিনির পুরো দ্বীপজুড়ে ছড়িয়ে আছে নানা ধরনের জীব এবং উদ্ভিদ। এ জন্য পুরো দ্বীপটিকে রেইন ফরেস্ট বললে ভুল হবে না। এখানে ভিন্ন জাতের ৩৮টি বার্ডস অব প্যারাডাইস বাস করে।

হোহ্ রেইন ফরেস্ট, যুক্তরাষ্ট্র: আমেরিকার রাজধানীর বুকে অবস্থিত এ রেইন ফরেস্টের কথা অনেকের কাছে অজানা। স্যাঁতস্যাঁতে এ জঙ্গলের গড় বৃষ্টিপাত বছরে ২৫০ ইঞ্চি। যার ফলে পৃথিবীর অন্য যে কোনও বনাঞ্চল থেকে এখানকার গাছপালা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

কাকুম ন্যাশনাল পার্ক, ঘানা: পশ্চিম আফ্রিকার এ বনাঞ্চলটি শুধু জীববৈচিত্র্যেই ভরপুর নয়, এটি বহু বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীর আবাসভূমি। এদের মধ্যে মোনা-মিরক্যাট, বামনহাতি এবং বুনো মেষ অন্যতম। এছাড়াও এখানে রয়েছে আরও বহু বিচিত্র ধরনের পাখি।

বাতায় আই ন্যাশনাল পার্ক, মালয়েশিয়া: এই গ্রীষ্মমণ্ডলী বনটি পূর্ব মালয়েশিয়ার বোর্নিও দ্বীপে প্রায় ২৪০ বর্গ কিমি এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে। এ বনের মধ্যে ২৪ কিমি দীর্ঘ একটি কৃত্রিম হ্রদ রয়েছে। এ বনাঞ্চলে ওরাং ওটাং, গিবন বানর, বিভিন্ন প্রজাতির ধনেশ পাখিসহ বেশ কিছু প্রজাতির বিপন্ন প্রাণী বাস করে।

মাদিদি ন্যাশনাল পার্ক, বলিভিয়া: বলিভিয়ার উত্তর-পশ্চিম দিকে ৪৭ লাখ একর জায়গা জুড়ে এ রেইন ফরেস্ট বিস্তৃত। এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তিন আঙুলের স্লথ, মাকড়সা, বানর, আজব চেহারার পেকারি অন্যতম।

এছাড়াও পৃথিবীতে আরও অসংখ্য ছোট-বড় বনভূমি রয়েছে। প্রতিটি বনভূমিই পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীকে এবং অগণিত প্রাণী ও উদ্ভিদকে বাঁচাতে হলে আমাদের এসব বনভূমিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।